

আত্মকথা

আত্মজা'র মুখপত্র



জানুয়ারি, ২০২৪

From Secretary's Desk

Atmaja is passing through a difficult time for last two years. On 17th August 2023, we have lost one of our dedicated member, Suranjan Saha. Like last few years, the Vijaya Sanmilani Program 2023 of Atmaja was supposed to be held at his Kalindi residence but we had to abandon project because of this sad incidence .

Our Neempith – Kaikhali Visit on 18-19th November was excellent. Eight member families from extreme north Kalyani to extreme south Garia had joined this long awaited short trip with pleasure and enjoyed those two days. After almost four dry years of ban due to Covid-19 the tour could be finally conducted.

There was an Adoption Meet in Howrah on 2nd December (DCPU) conducted by the Govt. of West Bengal. Atmaja was invited and Anjan Basu Chowdhury, Swapan Naskar and Abhinanda (daughter of Sri Joydeb Das one of our Atmaja member) had participated the meet on behalf of Atmaja.

The Kolkata DCPU meet was also held on 9th December at Salt Lake, the Atmaja Members had successfully contributed in the program and there was one Atmaja stall which had made an impact through interaction with several new Adoptive parents and subsequently we had few new members of Atmaja.

Our next big annual meet is Annual Picnic, to be held on 14th January at Kalyani. I expect that the meet will be a grand success as we are expecting almost all new members will be participating the Picnic.

Sanjoy Kumar Sikdar

Secretary

আত্মজার - আত্মকথা

একটু দেৱী হয়ে গেল এবাৰ আত্মকথার প্রকাশে। এরজন্যে কোন অজুহাতই গ্রহণযোগ্য নয়। এর দায় পত্রিকার পরিচালক মণ্ডলীর পক্ষ থেকে মাথা পেতে নিলাম। শুধু অনুরোধ রইলো সবার কাছেই ... আগামী জুলাই সংখ্যার জন্য লেখা, কবিতা, গল্প, ছবি পাঠাতে থাকুন এখন থেকেই। যাতে বেশ কিছুটা সময় থাকতেই আমরা প্রয়োজনীয় সংখ্যক লেখা, ছবি হাতে পেয়ে যেতে পারি। বেশ কিছু লেখার জন্যে এবারে অপেক্ষা করেছিলাম। শেষপর্যন্ত সেই সব লেখা এসে পৌঁছায়নি আমাদের কাছে। আশা করছি আগামী সংখ্যায় আমরা সেই সব লেখা প্রকাশ করতে পারব।

প্রচণ্ড শীতের জড়তা অতিক্রম করে শেষপর্যন্ত এই আত্মকথা আপনাদের হাতে তুলে দিতে পারলাম ... এটাই আমাদের আনন্দ। ভালো থাকবেন, ভালোবাসবেন, পাশে থাকবেন বন্ধুরা!

সম্পাদক মণ্ডলীর পক্ষ থেকে স্বপন নস্কর

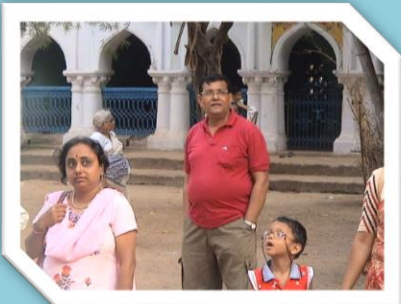
শোক ...

সুরঞ্জন-দা স্মরণে

সুরঞ্জন সাহা, আত্মজার বরিষ্ঠ সদস্যদের মধ্যে একজন, হঠাৎ করে না-ফেরার দেশে চলে গেলেন গত ১৭ই অগাস্ট ২০২৩ তারিখে। সুরঞ্জন-দা আত্মজার একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন, প্রায় প্রতিটি অনুষ্ঠানে উনি যোগ দিতেন; নিজের বাড়ীতেও অনেকবার বিজয়া-সম্মিলনী অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেছেন। সুরঞ্জন-দা ছিলেন রসিক এবং ভোজন প্রিয় মানুষ। আমাদের WhatsApp group-এ প্রতিদিন ওনার দু'-তিনটি Good Morning message পেতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছিলাম। তাঁর সদা হাস্যময় মুখে আন্তরিকতার অভাব ছিলনা।

সুরঞ্জন-দাকে আমরা ভীষণভাবে মিস্ করব। ওনার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি রইল আমাদের আন্তরিক সমবেদনা।

অনুপ দেওয়ানজী , চেয়ার পার্সন , আত্মজা



স্মৃতির সরণি বেয়ে সদা হাস্যময় সুরঞ্জনদা'র কিছু মুহূর্ত আত্মজার সঙ্গে, আত্মজার মধ্যে...

নিয়মিত বিভাগ – পাখীদের কথা - পর্ব ৭

দুর্গা টুনটুনি

প্রভাত কুমার চট্টোপাধ্যায়

পাখিটির নাম দুর্গা টুনটুনি। আসলে তারা টুনটুনি পরিবারের সদস্য মোটেই নয়। ইরেজিতে তাদের বলা হয় The Purple Sunbird। তবে আকারে বা স্বভাবে বেশ মিল আছে। অনেকে আবার এদের মৌচুমি বা মধু চুষকি বলেও ডাকে। তার কারণ হলো এরা ফুলের মধু পেলে আর কিছু বিশেষ চায়না। এই পাখিদের ঠোঁটের গড়নটাই এমন যে এরা সহজেই ফুলের বুকে বাঁকা ঠোঁট ঢুকিয়ে মোটা জিভ দিয়ে মধু চুষে খেতে পারে। তবে এরা রাঁচিতা ফুলের মধু খেতে খুব পছন্দ করে। তখন আর কোনো দিকে খেয়াল করেনা।

দুর্গা টুনটুনি চড়ুইদের চেয়ে খানিকটা ছোটো বটেই। ছেলেপাখিদের চকচকে কালো পালকে ঢাকা - গরমকালে এদের দেখা মেলে, সহজেই চিনতে পারা যায়। কালো পালকে লাল- হলুদ রঙের আভাস রোদ থাকলে বেশ বোঝা যায়। মেয়েপাখিদের অন্যসময় বা শীতের দিনে যেমন পালকের রঙ তেমন হয়ে যায় ছেলে দুর্গা টুনটুনিদের পালক। মানে গরমে এক রকম আর শীতকালে অন্যরকম। ছেলে দুর্গা টুনটুনিদের পালকে রঙ পাল্টায়। আর মেয়েপাখিদের সারাবছরই পালকের এক রকম রঙ থাকে - পিঠের, ডানার, মাথার দুপাশে, গলার পালক- সবজে খয়েরী। আর ছেলে দুর্গা টুনটুনিদের শরতকাল থেকে শীতকাল অবধি পালকের রঙ ঠিক এমনটাই হয়ে যায়। সেই সময়ে তাদের গলার তলা থেকে পেট পর্যন্ত বেগুনি রঙের একটা রেখা পালকে ফুটে ওঠে। তবে ডানার রঙ একই রকম থাকে - কালচে খয়েরী - কোনো পরিবর্তন হয়না, ঠোঁট আর পায়ের রঙও।

এই দুর্গা টুনটুনিরা ভীষণ ছটফটে। এরা গাছের ডালে ডালে ফুল দেখলেই হাজির হয় মধুর খোঁজে। সে কারণে তাদের দেখা মেলে অতি সহজেই ফুলের বাগানে। এই পাখিদের পছন্দের তালিকায় আছে নানান পোকা মাকড়। তাই খাবারের সন্ধানে এরা বাগানে, ঝোপের ভেতর ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। এই পাখিদের খুব একটা মাটিতে নেমে খাবার খুঁজতে দেখা যায়না। ডাল আঁকড়ে বুলে বুলে ফুলের মধু চুষে খেতে এরা খুব ভালোবাসে। এমনকি ঘন ঘন ডানা নেড়ে এক নিমেষে ফুল থেকে মধু চুষে নেয় উড়ন্ত অবস্থায়।

খুব একটা ভালো বাসা বানানোর কায়দা জানেনা। এদের বাসা দেখতে অনেকটা বুলন্ত দোলনার মতো। এই পাখিরা গাছের ডালে, পরিত্যক্ত বাড়ির বারান্দার ছাদের নীচের তলে আঁটায় নানা ধরনের জিনিস দিয়ে অনেকটা বড় সাইজের পেয়ারার মতো দেখতে বাসাটি বানায়। খড়কুটো, কাগজের টুকরো, পালক নিয়ে আসে আর বাসার মধ্যে ভরে রাখে। বাসা তৈরি করার সময় ছেলে দুর্গা টুনটুনিরা মজার সুরে গান ধরে। বাসায় ডিম পাড়া থেকে শুরু করে, তা দেওয়া, ডিম ফুটে ছানা বেরলে বাচ্চাদের যত্ন- আত্তি করা ও দেখভালের দায়িত্ব নিতে হয় মাকেই। অবশ্যই খাবার খোঁজ আর যোগানোর ভার থাকে ছেলে দুর্গা টুনটুনির উপরে। এরা ফুলের মধু পেলে আর কিছু বিশেষ চায়না, তবে ছোটো ছোটো পোকা মাকড় খেতেও পছন্দ করে।

দুর্গা টুনটুনির ছবি ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত



নিয়মিত বিভাগ – গনিতাশ্র – পর্ব ২

অনুপ দেওয়ানজী

টুটুল আর তিতলির মধ্যে ভীষণ ঝগড়া শুরু হয়ে গেছে। ডমিনোর দোকানী পিৎজার সাতটা টুকরো করে দিয়েছে। কে চারটে আর কে তিনটে খাবে এই নিয়েই ঝগড়া। কিছুতেই তারা দু'জনের মধ্যে সমান ভাগ করে উঠতে পারছে না। মার কাছে কিছুদিন আগে বানরের পিঠে ভাগের গল্প শুনেছে; তাই সাহস করে মার কাছেও যেতে পারছে না, পাছে তাদের ভাগ পুরোটাই মা খেয়ে ফ্যালে। এদিকে মা তাদের ঝগড়ার আওয়াজ শুনে এসে পড়েছে আর ঝগড়ার কারণটা জানতে পেরেছে। মা এসে সাতটা টুকরোকেই ঠিক অর্ধেক ভাগ করে মোট চোদ্দটা অর্ধেক টুকরো করে ফেললেন। এবার টুটুল আর তিতলির নিজেদের মধ্যে পিৎজা টুকরোগুলো ভাগ করে নিতে আর অসুবিধা হল না। একেক জন সাতটা করে অর্ধেক টুকরো পেল; তার মানে একেক জন তিনটে গোটা টুকরো আর একটা অর্ধেক টুকরো পেল, যাকে আমরা ইংরাজীতে three and half বলি। সাধারণ ভগ্নাংশ ব্যবহার করে আমরা লিখি $3\frac{1}{2}$, যেটা $\frac{7}{2}$ এর সমান। অর্থাৎ, সাতকে দুই দিয়ে ভাগ করলে যা হয়। দেখা গেল যে সাতটা টুকরোকে দুই ভাগ করা আর চোদ্দটা অর্ধেক টুকরোকে দুই ভাগ করা একই ব্যাপার।

টুটুল অঙ্কে একটু ভাল। তাই এই ব্যাপারটাতে একটু উৎসাহ পেয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মাকে বলে উঠল, তাহলে আমরা যদি তিনজন হতাম তুমি সাতটা পিৎজা টুকরোর প্রত্যেকটাকে তিন ভাগ করতে, যাতে মোট একুশটা টুকরো হত এবং তিনজনের মধ্যে ভাগ করা সহজ হত। প্রত্যেকে সাতটা করে ছোট টুকরো পেত। মা বললেন, একদম ঠিক। তাতে প্রত্যেকে দু'টো করে গোটা টুকরো পেত আর একটা করে ছোট এক-তৃতীয়াংশ (one third) টুকরো পেত। তার মানে প্রত্যেকে $2\frac{1}{3}$ পেত, যাহল $\frac{7}{3}$ এর সমান। অর্থাৎ, সাতকে তিন দিয়ে ভাগ করলে যাহয়। একইরকমভাবে এই সাতটা পিৎজা টুকরো যদি চারজনের মধ্যে ভাগ করতে হত, তাহলে প্রত্যেকটাকে চারভাগ করে মোট আটাশ ভাগ করে ভাগ করা সহজ হত। এইবার টুটুল বল তো যদি এই সাতটা পিৎজা টুকরো সাতজনের মধ্যে ভাগ করতে হত, তুমি কি করত? টুটুলের মেধাবী অঙ্কের মস্তিষ্ক সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল প্রত্যেকটা পিৎজা টুকরোকে সাতভাগ করতে আর সবাইকে সাতটা করে ছোট টুকরো দিতে। তিতলি চৈঁচিয়ে বলে উঠল সবাইকে একটা করে গোটা টুকরো দিয়ে দিলেই তো হয়ে যায়; আবার ভাগ করতে যাবে কেন! মা হেসে বলে উঠলেন, এবারে তিতলি বেশী ঠিক। প্রত্যেকটা পিৎজার টুকরোকে সাতভাগ করে আবার সবাইকে সাতটা করে ছোট টুকরো দিলে, প্রত্যেকে তো একটা গোটা টুকরোই পেল। তাই আর ভাগ করার প্রয়োজন নেই। তখন প্রত্যেকে $\frac{7}{7}$, অর্থাৎ একটা করে গোটা টুকরো পাবে।

টুটুল আর তিতলির উৎসাহ দেখে মা জিজ্ঞাসা করল, বল তো একটা গোটা টুকরো মানে ক'টা পিৎজা হল? টুটুলের কাছে এটা সোজা প্রশ্ন; সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, যেহেতু পিৎজাটাকে সাত ভাগ করা হয়েছে, একটা গোটা টুকরো মানে সাত ভাগের এক ভাগ বা একের সাত পিৎজা, যাকে ভগ্নাংশে $\frac{1}{7}$ লেখা যায়। মা বললেন, তাহলে তিনটে গোটা টুকরো মানে $\frac{3}{7}$ পিৎজা। ধর, এরকম দু'টো পিৎজা, একই রকম ও একই সাইজের, তোমাদের দু'জনের জন্য আনা হল। তিতলির পিৎজাটা সাত টুকরো করা আর টুটুলেরটা ছয় টুকরো করা। তোমরা দু'জনেই তোমাদের পিৎজা থেকে একটা করে টুকরো আমাকে খেতে দিলে। তাহলে তিতলির ছয় টুকরো আর টুটুলের পাঁচ টুকরো পড়ে রইল। কে কম বা কে বেশী পিৎজা পেল?

এই সময় তিতলি আর থাকতে পারল না। একে তো দু'টো পিৎজা আসেনি, যা নিয়ে নতুন একটা অঙ্ক শুরু হল। তার উপর চোখের সামনে যে পিৎজাটা পড়ে আছে, সেটাও খেতে পারছে না। সে ধুন্তোরি বলে নিজের সাতটা অর্ধেক টুকরো পিৎজা নিয়ে অন্য ঘরে চলে গেল।

টুটুল কিন্তু দমে যাওয়ার পাত্র নয়। সে সাধারণ জ্ঞান লাগিয়ে বলল, তিতলির যেহেতু ছয় টুকরো আর তার নিজের পাঁচ টুকরো, তাহলে তিতলিই বেশী পাচ্ছে। মা তখন মনে করিয়ে দিলেন যে তিতলির টুকরোগুলো টুটুলের টুকরোগুলোর চেয়ে আকারে ছোট। শুনে টুটুল বিপদে পড়ে গেল এবং বুঝতে পারল না কিভাবে এর উত্তর দেবে। ভাবতে লাগল, তিতলির মত বেশী অঙ্ক করার চেষ্টা না করে নিজের পিৎজার ভাগ নিয়ে কেটে পড়বে কিনা। কিন্তু অঙ্কের ব্যাপারে তার আত্মশ্রুতিয়ায় আঘাত লাগার ভয়ে লেগে রইল, যদিও আমতা-আমতা করা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারল না।

মা তখন শুরু করলেন তাঁর নিজের ব্যাখ্যা। তিতলির পিৎজার প্রত্যেক টুকরোকে ছয়টা সমান ছোট টুকরো কর, যাতে মোট বিয়াল্লিশটা সমান ছোট টুকরো হয়। একইভাবে টুটুলের পিৎজার প্রত্যেক টুকরোকে সাতটা সমান ছোট টুকরো কর, যাতে মোট বিয়াল্লিশটা সমান ছোট টুকরো হয়। এখন দু'জনের পিৎজাতেই বিয়াল্লিশটা করে সমান ও ছোট টুকরো আছে। মা তিতলির থেকে একটা টুকরো, বা ছয়টা ছোট টুকরো, নিলে তার

কাছে পড়ে রইল $82-6=76$ টা ছোট টুকরো। একইভাবে, মা টুটুলের থেকে একটা টুকরো, বা সাতটা ছোট টুকরো, নিলে তার কাছে পড়ে রইল $82-9=73$ টা ছোট টুকরো। অর্থাৎ, তিতলি একটা ছোট টুকরো পরিমাণ পিৎজা বেশী পাচ্ছে, যেটা হল পুরো পিৎজার বিয়াল্লিশ ভাগের এক ভাগ, বা ভগ্নাংশে $\frac{1}{10}$ পরিমাণ পিৎজা। তার মানে, ভগ্নাংশে তিতলি পাচ্ছে $\frac{76}{82}$ পরিমাণ পিৎজা, আর টুটুল পাচ্ছে $\frac{73}{82}$ পরিমাণ পিৎজা।

এখানে একটা প্রশ্ন আসছে। তিতলির পিৎজার সাত টুকরোর মধ্যে মাকে একটা দেওয়ার পর তিতলি পাবে ছয় টুকরো, অর্থাৎ সাত ভাগের ছয় ভাগ, বা ভগ্নাংশে $\frac{6}{7}$ পিৎজা। একই হিসাবে টুটুল পাবে ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ, বা ভগ্নাংশে $\frac{6}{5}$ পিৎজা। তাহলে অত বড় বড় সংখ্যাগুলো এল কোথা থেকে? এরকম ভগ্নাংশের অঙ্কে আমরা কাটাকুটি বলে একটা জিনিস দেখেছি। সেটাই এখানে হচ্ছে। তিতলির জন্য ৪২টা ছোট টুকরো মানে আসলে সাতটা বড় টুকরো, আর ৩৬টা ছোট টুকরো মানে ছয়টা বড় টুকরো। তাই ৪২ ভাগের ৩৬টা যা, সাত ভাগের ছয়টা একই ব্যাপার; শুধু পরের ক্ষেত্রে ভাগগুলো বড় বড়, একেকটা ভাগ ছয়টা ছোট টুকরোর সমান। একইভাবে, টুটুলের জন্য ৪২ ভাগের ৩৫টা যা, ছয় ভাগের পাঁচটা একই ব্যাপার; পরের ক্ষেত্রে একেকটা ভাগ সাতটা ছোট টুকরোর সমান।

সমঝদারের মত টুটুল মাথা নাড়াতে লাগল। তা দেখে মা জিজ্ঞাসা করলেন, তোদের দু'জনের থেকে এক ভাগ করে নিয়ে আমি মোট কতটা পিৎজা পেলাম? টুটুলকে চুপ করে থাকতে দেখে মা-ই ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন। তিতলির থেকে ছয়টা ছোট টুকরো, যা হল ভগ্নাংশে $\frac{6}{10}$ পরিমাণ পিৎজা। একইভাবে, টুটুলের থেকে সাতটা ছোট টুকরো, যা হল ভগ্নাংশে $\frac{7}{10}$ পরিমাণ পিৎজা। দু'টো মিলিয়ে হল তেরোটা ছোট টুকরো, যা হল ভগ্নাংশে $\frac{13}{10}$ পরিমাণ পিৎজা।

এবার টুটুলের মাথা ঘুরতে লাগল। সে নিজের সাতটা অর্ধেক টুকরো পিৎজা নিয়ে মার সামনে থেকে কেটে পড়ল। আর মা হেসে রান্নাঘরের দিকে হাঁটা দিলেন। যাবার আগে আমাদের বলে দিলেন যে দু'টো পিৎজাকেই সমান সমান বিয়াল্লিশটা ছোট টুকরোতে ভাগ করাই ছিল তাঁর আসল উদ্দেশ্য, যাতে কে কম বা কে বেশী তা সহজে বিচার করে যায়। আবার উনি নিজে কতটা পিৎজা পেলেন তারও একটা হিসাব পাওয়া যায়।

পিৎজা খেতে গেলেও যে এমন অঙ্ক করতে হবে সেটা টুটুল বা তিতলির ভাবনাতে ছিল না। যদি থাকতো, তাহলে পিৎজাটার ভাগাভাগি নিয়ে ঝগড়া করে ওটাকে ঠাণ্ডা হতে দিত না।

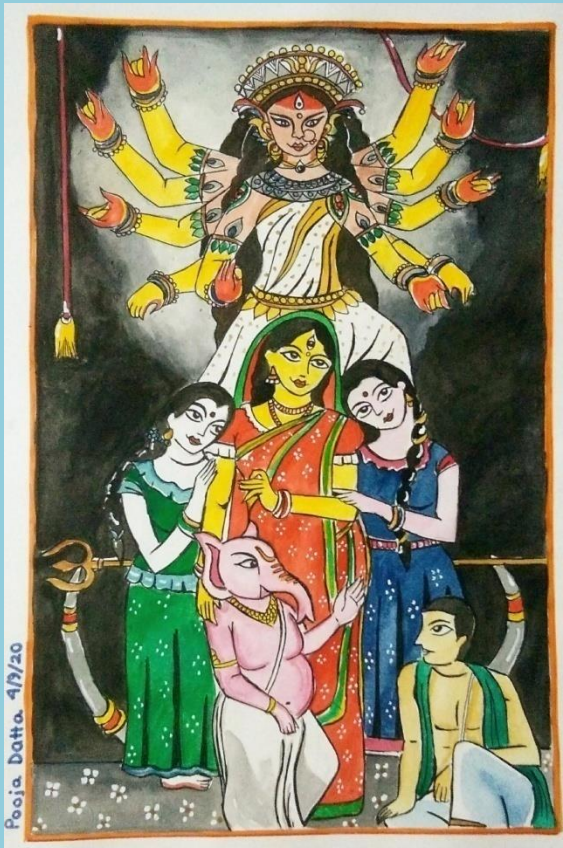
“ ছিল ছেলেবেলায় রামঠ্যাঙ্গ্যানি
কথায় কথায় চোখ রাঙানি,
নানা কারণ!
ছিল ইংরেজি বই পড়তে বসে
দুপুর বেলায় অঙ্ক কষা,
খেলা বারণ !”

হাতে নিয়ে তুলি পাত্রে নিয়ে রং - ছোটদের পাতা



তৌশিনি দাস
৫ বছর

পূজা দত্ত





শুভলক্ষ্মী

ঘোষ

সুচেতনা পাল



Matla Memories

Amit Dewanji

It is true when they say that the best things happen when you least expect it. Same happened during a weekend of November this year. Atmaja has been organizing quite a few trips in and around Kolkata, where families come together and make memories. I have been a part of it since my childhood, going for such trips, making new friends and stories to cherish later. This year we had a small weekend getaway, Nimpith was our destination. A lot of excitement and planning went into it. I was looking forward to meet my friends and their parents, with whom I grew up.

Our shuttle bus arrived in the morning, picking up each family along the way. There I met everyone. We hadn't met in a year but it felt like it was just yesterday, we all had smiling faces and were excited to reach Nimpith. The journey was about three hours but it felt like a very short time because we were all energetic and spending a good time. We reached there by noon. All of us were guided to the ashram for lunch. I was surprised to see the variety and amount of dishes they offered for a donation of just 10 rupees. I will not say anything about the taste as you can pretty much guess it. After lunch we were taken to our hotel at Kaikhali which was another hour away. The journey was pretty tiring as we had our bellies full and needed a bed, typical Bengalis you see.

After arriving at our hotel, the sleepy faces lit up with joy as it was right beside a beautiful river, Matla. With fast food shops and fruit sellers, it was an amalgamation of adventures. We could see boats taking tourists, people playing near the banks and most importantly we felt peace and calmness. Away from the city noise and pollution, we all were pretty content with the location. My friends and I decided immediately to drop off our luggage and go sit by the river. We all talked, clicked pictures and ate almost everything we could lay our eyes on. We might not say it out loud but we all needed this break. We needed the calmness and togetherness.

Soon the sun set and the sky showed its beautiful orange tone. Watching the birds fly in flocks almost seemed like a scene from a movie. With the setting sun came a pleasant cool atmosphere. The quietness and dark seemed to look much different here. In the evening, our parents wanted to visit the Ashram beside our hotel. There they enjoyed the melodic symphonies of the evening prayer, followed by a walk inside their beautifully decorated campus. Everyone called it an early night after a delicious dinner as they were tired, but not us. My friends and I sat on the terrace and gazed at stars, the kind of night sky that you don't get to see often. We could point out the constellations, planets and stars. The eeriness of the night never felt so comforting before.

The next morning we were all fresh and charged as we had activities planned ahead but we also knew that it was day to return to our mundane lives. We had booked a boat for our group, which took us to a tiger reserve in Jharkhali. The boat ride was really scenic, but the scorching sun was the only drawback. Yet we enjoyed the river wind and the lush green mangroves. Upon reaching, we took our mandatory group picture and took a small break over tea. At the tiger reserve, we were welcomed by our hosts, the monkey family. We all walked to see the tigers, we saw glimpses of them as they were mostly rescued tigers, but most importantly they were Royal Bengal tigers; so having Bengal in their names, they needed their must deserved afternoon naps.

As the day progressed we headed back to our hotel, sailing back through the river and enjoying the breeze. We had to check out soon so lunch was served. Soon we packed our belongings and headed towards the bus. We went to Nimpith with stressed minds and empty hands, yet over a night we came back with lots of beautiful memories, a relaxed and boosted mind and most importantly stories to tell others.

This is how a well-spent day with our loved ones and close friends can act as source of happiness in our lives. We are all looking forward to such trips and more new adventures.



বেশ কয়েক বছর পরে আত্মজার উদ্যোগে হৈ হৈ করে ঘুরে আসা হল নিমপীঠ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম এবং একদিনের জন্য রাত্রিবাস মাতলা নদীর ধারে মিশন পরিচালিত কৈখালি অতিথি নিবাসে... সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখছেন এই ট্যুরের নবীন সদস্য অমিত দেওয়ানজী এবং প্রবীন সদস্য শ্রদ্ধেয় শুভ্রা ঘোষ চৌধুরী

আত্মজার সঙ্গে আমার অভিজ্ঞতা

শুভ্রা ঘোষ চৌধুরী

আমি একজন পঁচাত্তর বছর বয়সের বৃদ্ধা। আমার মেয়ে একটি সন্তান দত্তক নিয়েছে। আত্মজা হল দত্তক পিতামাতাদের একটি সংস্থা। তাদের অন্যতম একটি উদ্দেশ্য হল দত্তক সন্তানদের এবং তাদের পরিবারদের নিয়ে একসঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সংঘবদ্ধ ভাবে থেকে জীবনটাকে একটু আনন্দের সাথে অতিবাহিত করা। সম্প্রতি আমি ওদের সঙ্গে নিমপীঠ আশ্রমে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে ঠাকুরের এবং মায়ের মন্দির দর্শন করে ভোগ খেয়ে আমরা কৈখালীতে নিমপীঠ আশ্রমেরই পরিচালিত একটি অতিথিশালায় ছিলাম। ওদের সঙ্গে যাত্রার শুরু থেকে আমি যে ব্যবহার পেয়েছি, তা বলে বোঝাতে পারবনা। আমি সবসময় নিজেকে নিয়ে খুব বিব্রত বোধ করতাম। আমি ভালো করে হাঁটতে চলতে পারিনা। সেই জন্য কোথাও যেতে চাইনা। কিন্তু আমার মেয়ে-জামাইয়ের অনুরোধেই আমি গেলাম।

কৈখালী থেকে পরদিন আমি ওদের সঙ্গে লঞ্চে করে ঝড়খালি বলে একটা জায়গায় বাঘ দেখতে গিয়েছিলাম। আমি কল্পনা করতেও পারিনি যে আমি লঞ্চে করে যাওয়ার জন্য ওঠা-নামা করতে পারব। কিন্তু আত্মজার সদস্যদের কাছ থেকে আমি যে সহযোগিতা ও সন্মান পেয়েছি, তা আমি লিখে শেষ করতে পারবনা। একজন বয়স্ক মানুষকে ওরা সকলে যেভাবে সাবধানে নিয়ে গেছে, তা আমি বোঝাতে পারবনা। আত্মজার ছেলেমেয়েরাও আমাকে যেভাবে হাত ধরে ধরে নিয়ে গেছে, তা আমি কখনও ভাবতেও পারিনি। আমি ওদের সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ করছি। আত্মজার কাছে আমার এই অনুরোধ যে আমার মত অশক্ত মানুষদের যেন ওরা এইভাবেই সেবা ও সহযোগিতা করে যায়। এই প্রতিষ্ঠানের অনেক শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি; আত্মজা যেন আরও অনেক বড় হয়ে ওঠে।

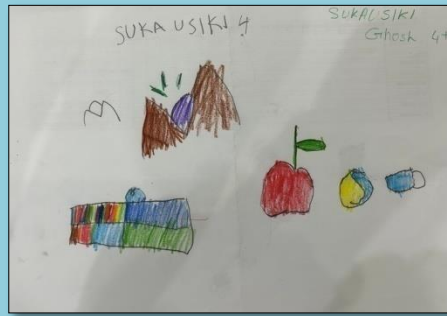
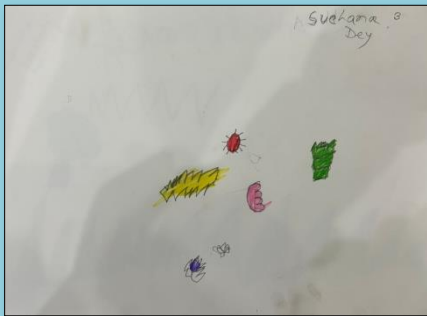
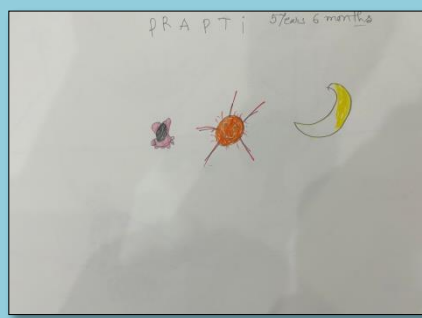
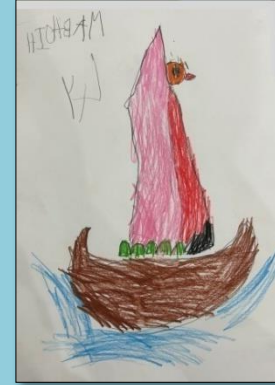
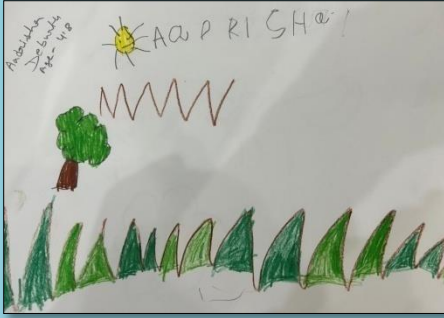
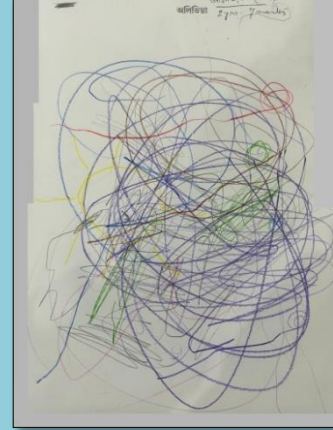
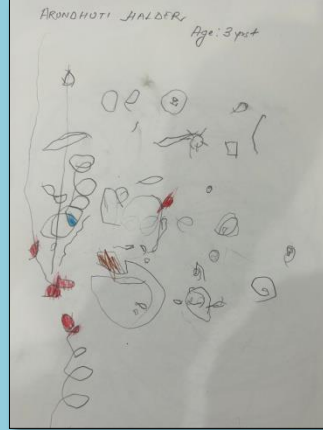
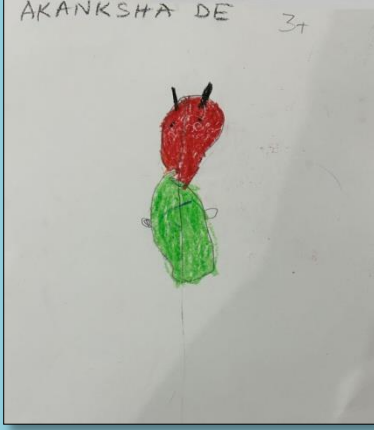
পিকনিক ...২০২৪

অন্যান্য বছরের মত এবারেও আত্মজার পিকনিক হয়ে গেল জানুয়ারি মাসের দ্বিতীয় রবিবার অর্থাৎ ১৪ জানুয়ারি ... কল্যানী গীতশ্রী পিকনিক গার্ডেনে ... আত্মজার সদস্য শ্রী অচিন বসুর তত্ত্বাবধানে। সেই পিকনিকের কিছু মুহূর্ত এবং একেবারে ক্ষুদেদের হাতে আঁকা কিছু ছবি আমরা পত্রিকার এই পাতায় রাখছি সবার জন্যে...



এবারে পিকনিকে বেশ কয়েকজন নতুন সদস্য এসে
আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন ... সারাদিন ধরে হাসি
ঠাট্টায় গানে গল্পে মেতে ওঠেন তিরিশটির বেশি পরিবার...

পিকনিক এর একটি অন্যতম আকর্ষণ ছিল ছোটদের জন্য বসে আঁকার উৎসব ...



উপরে বাঁদিক থেকে ... আকাঙ্খা , অরুন্ধতি , অলিভিয়া , অদ্রিশা , দৃতি , মাভৈ , মনোজা , প্রাপ্তি , রাজন্যা , সুচনা , সুকৌশিকি , স্বয়ন্তু ।

Atmaja Beyond Atmaja!!

Atmaja members addressing in the Adoptive Parents Meet organized by District Child Protection Unit, Howrah.



Atmaja members in the stall interacting with Adoptive Parents attending the Adoptive Parents Meet at Salt Lake , organized by State Women & Child Development and Social Welfare Dept.

ATMAJA FAMILY – A perspective

Ahana Basu

Atmaja family is a family with a mind of a huge joint family where we get brothers and sisters, close ones, uncle and aunties similar to our mother and fathers, where no one is considered as different but member of the same family. Atmaja is a group of adoptive parents; all members of this group are adoptive parents. Now the practice of adoption has grown tremendously, especially in West Bengal, and this Atmaja group certainly has some contribution towards this.

We, the children of Atmaja, heard from our parents about adoption, telling and making us understand about our own adoption. As we grew up, we slowly understood it better and felt more comfortable about it. An adopted child, as she grows up, will hear about her own adoption either from her parents or from others; is there any difference actually? I personally feel that the answer is a big 'Yes'. We, the children of Atmaja, have absolutely no problem with being adopted as our parents made sure, from the very beginning, that we feel comfortable with that idea. Moreover, we do not feel to be any different from other children; our lives are no more or no less complicated than those of others. Rather, we feel to be blessed that God sent us to these parents where we were destined. Our lives are normal and we count ourselves to be lucky that we are children of two mothers who took

much struggle in their lives to make us what we are today, one by giving birth and the other by bringing us up. We feel to be more lucky as we get blessings from two mothers. We also have a huge family like this Atmaja organisation which has taught us the meaning of adoption with love and affection and positivity. There are so many negative connotation with the word 'adoption'; it is our duty to truly make the word so lovable and positive that adopted children as well as adoptive parents feel good and get encouraged.

Atmaja family holds picnic, short tours, workshop, etc., to keep the connectivity and also to spread the love and affection that we share. Atmaja family has already completed so many years, some children of the family have grown up, shining in their own world, some have become teacher, corporates, etc..

Legal ground can be safeguarded through laws, but in a journey of life, children also face some emotional trauma. This is where Atmaja family protects us, not only the children but also their parents. So, in short, it is a history of a huge family. We, children of the next generation, have to make it more popular. Most importantly, we have to keep changing the meaning of adoption to this world which still does not accept or understand it properly.

Down Memory Lane....



পিকনিক ২০২৩ ... গঙ্গার পাশে আড়িয়াদহ মিলন সংঘের মাঠে

"Navigating the Depths of Adoption: Parenting Older Children with Compassion"

Sahana Rishu

In recent times, an unsettling trend has emerged – parents returning adopted children, especially those above the age of four, to shelters. It's a heartbreaking reality that prompts us to delve into the complexities of adoption, inviting a collective reflection on the challenges and responsibilities that come with parenting older children.

The most cited reason for these returns is often labeled as "adjustment issues." However, this phrase masks a deeper truth – these children carry profound emotional baggage from their past. Separation from birth parents, separation from care givers at shelters, limited or no exposure to the world outside shelters, and the absence of parental touch contribute to a sense of disconnection that cannot be easily overlooked.

But should we shy away from adopting older children? The answer is a resounding "NO." Instead, we must first understand how we, as prospective parents, can equip ourselves to nurture and parent children aged four and above.

1. Preparedness for Parenthood:

Before embarking on the journey of adoption, ask yourselves how prepared you are to become parents to an older child. Acknowledge the potential challenges and embrace them as part of the profound journey you are about to undertake. What is your motivation for Adoption. Are you adopting because society asks for it, or is it due to social pressure? If these are your reasons then pause and rethink your decision.

2. Grasping Generic Parenting Challenges:

Understand the generic parenting challenges that may arise and how they might differ when parenting an older child. This knowledge lays the foundation for realistic expectations and effective parenting strategies. Evaluate whether you have pre-defined concepts of how a child should behave. Adjust your expectations to be realistic and considerate of the child's unique background and experiences. Expecting a child to instantly know social etiquettes or behave in front of guests is unrealistic. Are you aware of what is a tantrum and what needs genuine attention? These are some of the things that as a prospective parent you may need to look out for. Hence be realistic with what to expect and what not to.

3. Schooling Considerations:

This is one of the grey areas of adoption I would say. Most of the parents assume the child will cope up with everything. However, here is where the children needs the parent's understanding the most. Some of the questions parents must answer here is "are we ready to align admissions with the child's intellectual age?" Many children This thoughtful consideration ensures a supportive learning environment that caters to the child's unique needs. Be ready to admit older children to lower classes

based on their education level. Speak to the schools in area in advance to understand how much willing they are to support for the growth of children without putting an undue pressure on them.

4. Emotional Availability:

Assess your emotional availability. Are you genuinely ready to connect with the child on an emotional level? Creating a bond with an older child requires patience, understanding, and a willingness to bridge the emotional gaps. Will you be able to manage work-Life Balance because children will need more of your time. Is your organization understanding enough to provide you option to work from home or even consider longer leaves. Being available to listen is most essential part of building connection. How available are you? Are you appointing a nanny to cater to your child or you have planned out your day in a way that you can spend enough quality time without getting distracted with a gadget.

5. Unconditional Commitment:

Reflect on your commitment level. If your biological child faced physical or psychological challenges, would you consider disowning them? Adoption demands an unconditional commitment to the well-being of the child, irrespective of challenges. As prospective parents, it's crucial to engage in open and honest conversations with your partner. Discuss fears, insecurities, and expectations about the adoption journey. Parenthood, whether through adoption or biology, is a monumental task that requires resilience, compassion, and an unwavering commitment to the child's best interests.

6. Seeking Help and Understanding:

Agencies play a vital role in preparing children for family life. They should provide a general overview of family expectations, ensuring a smoother transition into a new environment. However, one cannot solely depend on the agency to prepare the stage. Parents need to understand that children require time to open up, adjust, connect, and grow within the family. Patience, as vast as the ocean, is the key. Connect with other parents who have adopted older kids, consult with a counselor, and work collaboratively to fix challenges instead of resorting to dissolution of adoption.

In conclusion, parents are urged to think and act wisely, seeking help when needed. The dissolution or disruption of adoption is a heavy burden for both parents and children. Let us collectively work towards creating an environment where every child, regardless of age, can find a loving and supportive home, fostering a culture of enduring commitment in the realm of parenthood.

প্রথমজন দেখেছিলেন তোমার প্রথম হাসি,
দ্বিতীয়া চোখ মোছালেন তোমায় কোলে নিয়ে...
এখন তুমি বারে বারে প্রশ্ন কর মোরে, যে প্রশ্নটি করা হয়েছে যুগ যুগ ধরে -
“বংশ” নাকি “পরিবেশ” তুমি কিসের হলে ফল
কোনটারই নও তুমি,
তুমি শুধু, একটা নয়, দু’দুটো মায়ের ভালোবাসার যোগফল...

যুদ্ধজ্বর – দ্বিতীয় পর্ব

স্বপন নস্কর

সভ্যতার সঙ্কট এবং রবীন্দ্রনাথ

এই পর্বে প্রবেশ করার আগে প্রথম পর্বে বলা গুটি বসন্তের ভ্যাকসিন নিয়ে কিছু সংযোজন করছি। এই জন্যে আমি ছোটবেলার বন্ধু সুপ্রিয় লাহিড়ীকে (ফার্মেসী ইন্ডাস্ট্রিতে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এবং এই মুহূর্তে ইন্ডাস্ট্রিতে অন্যতম ব্যক্তিত্ব। এছাড়াও সুপ্রিয় একজন অসাধারণ গল্পকার এবং লেখক) আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই বিষয়টির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে।

ডঃ জেনার এই ভ্যাক্সিন আবিষ্কার করার আগেও এইভাবে রোগ প্রতিরোধ করার একটা অনেক পুরনো ইতিহাস আমরা পাই ভারতে এবং চীনে। এই পদ্ধতিকে ভেরিওলেশন (Variolation) বলা হত। যাতে রোগাক্রান্ত মানুষের শরীরের গুটি থেকে দেহরস নিয়ে অন্যদের শরীরে প্রবেশ করানো হত। এই পদ্ধতি চীন থেকে ভারতে এসেছিল না ভারত থেকে চীনে প্রচলিত হয়েছিল সেটা সঠিক ভাবে জানা যায়না। তবে ইউরোপ অথবা আমেরিকাতে এই রোগের প্রথম প্রাদুর্ভাব যখন হয় তখন একে ইন্ডিয়ান প্লেগ বলেও অনেকে বর্ণনা করেছেন। এই পদ্ধতির তিনটি প্রধান অসুবিধা আমরা দেখি – ১) টিকাকরণের পরে অনেক মৃদু উপসর্গ এলেও শরীরে স্থায়ী চিহ্ন থেকে যেত ২) টিকা নেওয়া মানুষের সংস্পর্শে এলে অন্যান্য ব্যক্তিরও আক্রান্ত হয়ে পড়তেন এবং ৩) টিকা নেওয়া মানুষের অনেকেই অসুখটি হয়ে মারা যেতেন শেষ পর্যন্ত এবং সেই সংখ্যাটি বেশ উদ্বেগ জনক। যদিও সঠিক ভাবে নথিবদ্ধ কোন তথ্য আমাদের কাছে নেই যে কত মানুষের টিকা দেওয়া হয়েছে এবং তাতে সাফল্যের প্রকৃত হার কত। এই পদ্ধতির প্রচলন কে করেছিলেন সেটাও সঠিক ভাবে জানা নেই আমাদের।

ডঃ জেনার প্রথম এটা খেয়াল করেন গোয়ালারা এই অসুখে আক্রান্ত হচ্ছেন যে সমস্ত গরু এই অসুখে আক্রান্ত তাদের থেকে এবং এই ক্ষেত্রে উপসর্গ অনেক মৃদু এবং মৃত্যু প্রায় নেই। সারা নেলম বলে এক গোয়ালিনীর হাতের গুটি থেকে দেহরস নিয়ে তিনি একটি বাচ্চার শরীরে প্রবেশ করান। ছেলেটি কয়েকদিন পরে সামান্য অসুস্থ হয় এবং কয়েকদিন পরেই সুস্থ হয়ে যায়। এরপর ডঃ জেনার ছেলেটির শরীরে একজন প্রবলভাবে গুটি বসন্ত আক্রান্ত রোগীর শরীর থেকে দেহরস নিয়ে প্রবেশ করান, এবার ছেলেটির আর কোন অসুস্থতা দেখা যায়না। ডঃ জেনারের এই আবিষ্কারের বিশেষত্ব হল এই ভ্যাকসিন অনেক নিরাপদ এবং কার্যকরী। এই আবিষ্কারের সামগ্রিক সাফল্য এবং গুরুত্বের কথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

স্প্যানিশ ফ্লু

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সাথে সাথে আসার জন্যে আমরা যুদ্ধজ্বর বলেও আমরা চিহ্নিত করি পাখীর শরীর থেকে আসা এই মারণ রোগকে। সেই মুহূর্তে কোন ওষুধ না থাকার জন্যে এবং মানুষের শরীরেও রোগ প্রতিরোধের কোন ক্ষমতা না থাকার জন্যে অজস্র মানুষ মারা যান এই অসুখে। H1N1 ইনফ্লুয়েঞ্জা A নামে একটি ভাইরাস এই অসুখের জন্যে দায়ী কিন্তু সেটাও আমরা জেনেছি অনেক পরে। বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে এই অসুখের তান্ডব চলেছিল। সেই সময় যুদ্ধকালীন তথ্য গোপনীয়তা রক্ষার কারণে অসুখটি নিয়ে সংবাদ ঠিকমত প্রকাশিত হতনা। এই অতিমারির নাম দেওয়া হয়েছে স্প্যানিশ ফ্লু ... তার একমাত্র কারণ হচ্ছে ২০১৮ সালের এপ্রিল মাসে মাদ্রিদ থেকে একটি প্রেসনোট এই অসুখের ছড়িয়ে পড়ার খবর প্রথম প্রকাশ করে। কিন্তু প্রথম যে অসুস্থতার তথ্য লিপিবদ্ধ হয়ে আছে সেটা এসেছিল ইউ এস এ থেকে। পরবর্তী সময়ে অসুখটি ফ্রান্স, জার্মান, এশিয়া হয়ে আমাদের ভারতবর্ষেও পৌঁছে যায়। এখানে মনে রাখতে হবে যে নিরপেক্ষ দেশ হবার জন্যে স্পেনের সংবাদ মাধ্যম সেন্সরশিপের কবলে ছিলোনা বলে আমরা প্রথম এই অতিমারির খবর স্পেন থেকে পাই কিন্তু এই অসুখটির প্রকৃত উৎসস্থল নিয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা যায়নি।

ঠিক কত প্রাণ চলে গিয়েছিল এই অতিমারিতে। এটা নিয়েও কোন ঐকমত নেই। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেছেন কুড়ি মিলিয়ন, কেউ বলেছেন পঞ্চাশ মিলিয়ন আবার অনেকেই বলেছেন মৃত্যু সংখ্যা একশো মিলিয়ন ও হতে পারে। সংখ্যাটা একশোর কাছাকাছি হওয়াই স্বাভাবিক কারণ শুধু ভারতেই মারা গিয়েছিলেন প্রায় দেড় কোটি মানুষ (১২ থেকে ১৭ মিলিয়ন বিভিন্ন সংবাদ সূত্র অনুযায়ী)। ১৯১১ থেকে ১৯২১ একমাত্র এই দশকেই ভারতের সেন্সাস অনুযায়ী আমরা জনসংখ্যার হ্রাস লক্ষ্য করেছি একমাত্র এই অতিমারির কারণেই (কলেরা, ম্যালেরিয়া, ফ্লু)।

অনেক ঐতিহাসিকের মতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে শক্তির যে নতুন বিন্যাস সৃষ্টি হয় পৃথিবীর বুকে তারজন্যে এই অতিমারি খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। অতিমারিতে সবথেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয় অস্ট্রিয়া এবং জার্মানি (অক্ষ শক্তি) । তুলনামূলক ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ডে (মিত্র শক্তি) ক্ষতির পরিমাণ ছিল কম।

আরো একটি বিষয় আমাদের মনে রাখা উচিত ... ১৯১৮ থেকে ১৯২০ মোট চারটি অতিমারির চেউয়ে আমাদের এই পৃথিবীর প্রায় ৫০০ মিলিয়ন মানুষ আক্রান্ত হয় (প্রায় মোট জনসংখ্যার একতৃতীয়াংশ) আর মৃত্যু হার ১ থেকে ৭ % অবধি পৌঁছে যায় বিভিন্ন স্থানে। প্রতিটি চেউ তার আগের চেউ থেকে আরো মারাত্মক চেহারা নেয় । এর কারণ প্রথমত বিশ্বযুদ্ধের কারণে সৈন্যদলের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হওয়া এবং একটি চেউ চলে যাবার পরে মানুষের অসতর্ক হয়ে যাওয়া। ১৯১৮ সালের মার্চ মাসে ইউ এস এ থেকে যে মহামারির শুরু হয় ১০২০ সালের এপ্রিল মাসে চতুর্থ চেউয়ের শেষ পর্যায়ে জাপানে সম্ভবত তার শেষ দেখি আমরা।

মহামারি এবং রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের জীবদ্দশায় একটা বা দুটো নয় । নয় নয় করে অন্তত চারটে মহামারী দেখে গিয়েছেন । কিন্তু এ আর বড়ো ব্যপার কী ? একটা মানুষ আশি বছরের উপরে বেঁচেছেন ... বিশেষ করে সেই সময়ে যখন আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান এত উন্নত হয়নি ... ভারতবর্ষে মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বলতে প্রায় কিছুই ছিলনা ... তখন এরকম মহামারী বেশ কিছু আসাটাই স্বাভাবিক ঘটনা। এ আর এমন কী আহামরি ঘটনা । আজকের এই ভয়াবহ পরিস্থিতি এলে তিনি কী করতেন সেটা নিয়ে কষ্ট কল্পনা করার কোন অর্থ হয়না । বেশ ! তাহলে একবার ফিরে তাকানো যাক সেই কালখন্ডে ... যে সময়টায় রবীন্দ্রনাথ যৌবনকাল শেষ করে প্রৌড়ত্বে পা দিয়ে বার্ষিক্যে এসে পৌঁছাচ্ছেন । এর মধ্যেই তিনি নোবেল পুরস্কার পাচ্ছেন আর তৈরী হয়ে যাচ্ছে তাঁর স্বপ্নের শান্তিনিকেতন।

আজ যখন এই অতিমারিতে আমরা বিপর্যস্ত এবং হয়ত কিছুটা দিশাহারা তখন আরো একবার আমাদের স্মরণ করতেই হবে তাঁকে । যে মানুষটা তাঁর নিজের জীবনে চারখানা মহামারী দেখেছেন । শুধু দেখেছেন তাই নয় ... এই সময়ে তাঁর সাহিত্য , শিল্প সৃষ্টি যেমন থেমে থাকেনি ... তেমনি থেমে থাকেনি সমাজের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা । তাই আমরা দেখেছি তিনি ভগিনী নিবেদিতার সাথে একসাথে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে মানুষকে সচেতন করেছেন ... আচরন বিধি শিখিয়েছেন এই মহামারীর সময়ে । তিনি এবং ঠাকুরবাড়ির আরো অনেকে একসঙ্গে চাঁদা তুলেছেন ... হাসপাতাল করেছেন মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে । এবং তারপরে কলেরা যখন মহামারীর আকার নিল তখন হারিয়েছেন পুত্রকে । তার আগে অবনীন্দ্রনাথ ও হারিয়েছেন তাঁর কন্যাকে । এরপরে যখন ইউরোপ থেকে ফ্লু মহামারী হয়ে এলো আমাদের দেশে ... তখন তিনি শান্তিনিকেতনে ঘুরে ঘুরে ছাত্রদের খাওয়াচ্ছেন পঞ্চতিত্ত রস নামে একটি পানচন যা তিনি নিজে তৈরী করেছিলেন। আবার এই সময়েই তাঁর হাত থেকে আমরা পেয়েছি অজস্র কালজয়ী সৃষ্টি । তাঁর চতুরঙ্গ এবং গোরা উপন্যাসে , দিদি এবং দুর্বুদ্ধি ছোটগল্প এছাড়া অজস্র প্রবন্ধে (দেশনায়ক , ওলাওঠার বিস্তার) এই মহামারি তথা কলেরা , ম্যালেরিয়া , ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং মানুষের দুর্দশা , মৃত্যুর ছায়া পড়েছে গভীরভাবে। এই সময়ের কথা মনে রেখে আমরা কবির দুঃসময় কবিতাটিকে স্মরণ করতে পারি আজ ...

“যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্তরে,
সব সংগীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া,
যদিও সঙ্গী নাই অনন্ত অশ্বরে,
যদিও ক্লাস্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,
মহা-আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে,
দিক্-দিগন্ত অবগুষ্ঠনে ঢাকা--
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা”

এইবার আসুন এক অন্ধকারের মুখোমুখি হই আমরা ... কবির ভাষায় - এক অদ্ভুত আঁধার নেমে এলো পৃথিবীর বুকে..।।

পৃথিবীর বুকে অতিমারির যে ইতিহাস আমরা পিছনে ফেলে এসেছি তার মধ্যে এই প্রতিবেদনে বর্ণনা করা অতিমারি ছাড়াও আরো অনেক মহামারি এসেছে যা মানব সভ্যতার সঙ্কট হিসাবেই দেখা দিয়েছিল । এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল – একাদশ শতাব্দীর ইউরোপে কুষ্ঠ অতিমারি , ঊনবিংশ শতাব্দীতে তৃতীয়বারের প্লেগ যেটা চীন এবং ভারতবর্ষে বেশ বিস্তৃত হয়েছিল, বিংশ শতাব্দীর এশিয়ান ফ্লু যেটা ইউরোপ বিশেষ করে

ইংল্যান্ডে বেশ ভয়াবহ চেহারা নিয়ে এসেছিল। এছাড়াও আমাদের উল্লেখ করতে হবে ১৯৮০ সালে আবির্ভূত এডস যার চিকিৎসা আজও বিজ্ঞানের অনুসন্ধানের বিষয়। তবে এডস যেহেতু ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ ছাড়া সংক্রামিত হয়না তাই একে নিয়ন্ত্রণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ।

একটা বিষয় বেশ লক্ষণীয় যে এই সমস্ত সঙ্কটের মুহূর্তে মানবসভ্যতা ঘুরে দাঁড়িয়েছে প্রতিবার এবং প্রতিবারই সে নতুন নতুন আবিষ্কার করেছে তার অগ্রগতির পথে। এর সাথে আরো একটি বিষয় বলা প্রয়োজন যে একটি অতিমারি আমাদের যখন বিপর্যস্ত করেছে তখন মানুষ সেখান থেকেই যে শিক্ষা পেয়েছে তাকে কাজে লাগিয়েছে পরের অতিমারিতে।

এবার আমরা বর্তমান অতিমারির যে সঙ্কট তারমধ্যে প্রবেশ করব ... তবে তার আগে এই ফ্লু বা ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস যে সমস্ত অতিমারি এনেছে পৃথিবীতে সেই সম্মন্ধে কিছু তথ্য দেখে নেব।

ইনফ্লুয়েঞ্জাও কিন্তু করোনার মতই সিঙ্গল স্ট্র্যান্ডেড আর এন এ (ssRNA) ভাইরাস (এই সম্মন্ধে পরে আর একটু বিশদে আলোচনা করা যাবে) কিন্তু চরিত্রের দিক থেকে অপেক্ষাকৃত নিরীহ। ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের প্রধান উপাদান দুটি গ্লাইকোপ্রোটিন (Glycoprotein) - যারা হল - Hemagglutinin আর Neuraminidase এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের মধ্যে এদের সংখ্যার অনুপাতের বিভিন্ন রকম তারতম্য হতে পারে - Hemagglutinin এর ক্ষেত্রে H1 থেকে H18 এবং Neuraminidase এর ক্ষেত্রে N1 থেকে N11 পর্যন্ত। এবং এইভাবেই আমরা পাই H1N1 (স্প্যানিশ ফ্লু , ১৯১৮-২০) , H2N2 (এশিয়ান ফ্লু , ১৯৫৭) , H3N2 (হংকং ফ্লু , ১৯৬৮) , H1N1 (সোয়াইন ফ্লু , ২০০৯)। এর সাথে একটা কথাও মনে রাখতে হবে যে ভাইরাস যেহেতু খুব সহজেই নিজেকে মিউটেট করে ফেলতে পারে তাই আমরা প্রায় প্রতিবছরেই এই ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের নতুন ভ্যারিয়েন্টের সম্মুখীন হই। এই কারণেই ইউরোপ আমেরিকাতে প্রতি বছরেই ফ্লু শট দেওয়া হয় এই ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রতিষেধক হিসাবে।

আসুন, ইতিহাসের পাতায় অতিমারির বর্ণনা ছেড়ে এবার আমরা আসি একবিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায় যেখানে উঁকি দিতে শুরু করল আজকের এই সঙ্কটের প্রধান চরিত্র ... করোনা ভাইরাস।

অশনি সংকেত (এক) – সার্স (SARS CoV)

২০০২ সালের নভেম্বর মাসে দক্ষিণ চীনের গুয়াংডং প্রদেশে প্রথম এই সার্স বা Severe Acute Respiratory Syndrome নামে করোনা ভাইরাসটি দেখা দেয়। এরপর ২০০৪ সাল পর্যন্ত এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে হংকং এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও। প্রায় আট হাজার মানুষ আক্রান্ত হয় এই অসুখে এবং আটশোর কাছাকাছি মানুষ মারা যান। ভারতবর্ষেও তিনজন সেই সময়ে এই অসুখে আক্রান্ত হয়েছিলেন... কিন্তু মারা যাননি তাঁদের কেউ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই অসুখটি নিয়ে সতর্ক বার্তা ঘোষণা করে ২০০৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। কিন্তু একটা কথা মনে রাখা দরকার চীনের প্রতি একটা অভিযোগ সেদিনও উঠেছিল এই অসুখটি নিয়ে সময় মত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মাধ্যমে অন্যদের সতর্ক না করার জন্যে। ২০০৩ সালের জুলাই মাসে WHO এই অতিমারির শেষ ঘোষণা করলেও আমরা ২০০৪ সালের মে মাসেও এই অসুখে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর খবর পেয়েছি। এরপরেই বিশ্বজুড়ে শুরু হয় এই ভাইরাসটি (SARS CoV 1) নিয়ে গবেষণা এবং এর বিরুদ্ধে সম্ভাব্য প্রতিরোধের জন্যে ভ্যাক্সিনের অনুসন্ধান।

অশনি সংকেত (দুই) – মার্স (MERS CoV)

২০১২ সালের এপ্রিল মাসে আমরা আবার প্রায় একই রকম একটি ভাইরাস বাহিত অসুখের বহিঃপ্রকাশ দেখতে পেলাম সৌদি আরবের জেড্ডাতে। উৎসস্থলের জন্যে এর নাম দেওয়া হল MERS CoV (Middle East Respiratory Syndrome)। বলা হল এটিও একটি সিঙ্গল স্ট্র্যান্ডেড আর এন এ ভাইরাস এবং এর মৃত্যুহার আরো বেশি। তবে সৌভাগ্যের বিষয় সৌদি আরব এই অসুখটির জন্যে বিশ্বকে সতর্ক বার্তা দিতে বিন্দুমাত্র দেরী করেনি। ফলে সমস্ত দেশ আগাম সতর্কতা নেওয়ার জন্যে ক্ষয় ক্ষতি অনেক কম হয়েছে। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এই অতিমারিতে মৃত্যু সংখ্যা আটশোর মত।

২০০২ সালের সার্স কোভিড ভাইরাস ১ এবং ২০১২ সালের মার্স কোভিড ভাইরাস আমাদের ঘুম থেকে জেগে উঠতে বাধ্য করে এবং সমস্ত বিশ্ব জুড়েই এই বিশেষ আর এন এ ভাইরাস নিয়ে গবেষণা শুরু হয়ে যায়। বিশ্ব বিখ্যাত ড্রাগ ম্যানুফ্যাকচারার ফাইজার ২০০২ সালে এই SARS CoV 1 এর জন্যে ওষুধ এবং প্রতিষেধক তৈরি করতে শুরু করে দেয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই যেহেতু ভাইরাসটি পৃথিবী থেকে চলে যায় তাই তাঁরা বন্ধ করে দেন সমস্ত উদ্যোগ। তখন কী কেউ জানত যে আবার বছর কুড়ি পরে পৃথিবীর বুকে ফিরে আসবে এই ভাইরাস এক মারাত্মক চেহারা নিয়ে আর আবার নতুন করে শুরু হবে ওষুধের সন্ধান , ভ্যাকসিনের সন্ধান!

অশনি সংকেত (তিন) – সার্স (SARS CoV 2)

পৃথিবীর বুকে মহামারি , অতিমারির এই ইতিহাস এবং মানব সভ্যতার লড়াই মাথায় রেখে এবং ২০০৩ সালে আর তারপরে ২০১২ সালে এই করোনা ভাইরাসের আবির্ভাব এবং বিবর্তন মনে রেখেই আসুন এবার আমরা প্রবেশ করি এই মুহূর্তে আমাদের পৃথিবীতে মানব সভ্যতার এক অভূতপূর্ব সঙ্কটের মধ্যে ... যার পোশাকি নাম – করোনা ভাইরাস ২ অথবা SARS CoV 2

২০১৯ সালের ১৭ই নভেম্বর চীনের হুবেই প্রদেশে এক রোগীর শরীরে অদ্ভুত উপসর্গ দেখা যায় যাকে সঠিক ভাবে সনাক্ত করা যায়না বলে চিকিৎসকেরা শুধু অজানা অসুখ বলে ঘোষণা করেন। এরপরে আরো প্রায় আটজন রোগীর শরীরে এই একই উপসর্গ দেখা দেয় এবং চিকিৎসকেরা এক অজানা ভাইরাসের দিকে ইঙ্গিত করতে শুরু করেন । ২০১৯ সালের ৩০শে ডিসেম্বর হুবেই প্রদেশের উহান শহরের হাসপাতালের ডাক্তাররা এক রহস্যজনক নিউমোনিয়ার রিপোর্ট করেন একসঙ্গে অনেক লোকের শরীরে। ডঃ লি ওয়েলিয়াং (Dr. Li Wenliang) বলে এক চক্ষু বিশেষজ্ঞ ইতিহাসের পাতায় হয়ত অমর হয়ে থেকে যাবেন একজন হুইসিল ব্লোয়ার হিসাবে। যিনি তাঁর এক সহ চিকিৎসকের কাছ থেকে জানা এক রিপোর্ট উহান মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তনীদের হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপে শেয়ার করেন এই সিভিয়ার অ্যাকিউট রেসপাইরেটরি সিনড্রোম বা SARS CoV এর সম্ভাব্য বিপদ নিয়ে। এর পরেই উহান শহরের পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে সোশ্যাল মিডিয়াতে ফেক নিউজ ছড়িয়ে আতংক সৃষ্টি করার জন্যে । এবং ঠিক একমাস পরে ৭ই ফেব্রুয়ারি ২০২০ ডঃ ওয়েলিয়াং মারা যান কোভিড আক্রান্ত হয়ে।

ততদিনে অবশ্য বিজ্ঞানীরা বুঝে গেছেন এই ভাইরাসটি SARS CoV নয় – এক নতুন করোনা ভাইরাস SARS CoV 2 । ১১ই ফেব্রুয়ারি এই ভাইরাসটির নাম দেওয়া হল করোনা অথবা Corona Virus Disease 2019 সংক্ষেপে Covid – 19 . এর পরেই চীনের সরকারের পক্ষ থেকে মৃত ডঃ লি ওয়েলিয়াং এর পরিবারের কাছে সরকারীভাবে ক্ষমা চায় এবং তাঁর বিরুদ্ধে যে পুলিশ কেস ছিল সেটা তুলে নেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে তাঁকে সম্মান জানানোর জন্যেই মেডেল প্রদান ও করে চীন সরকার। ডঃ লি ওয়েলিয়াং এর পরিবার চীনের সরকারকে ক্ষমা করেছে কিনা জানা নেই ... তবে সমস্ত পৃথিবী চীনকে এই খবরটি গোপন করে রাখার জন্যে ক্ষমা করতে পারবে কিনা সেটা ভবিষ্যৎই একমাত্র বলতে পারবে।

কারণ ১১ই মার্চ ২০২০ বিশ্বস্বাস্থ্যসংস্থা WHO যখন একে অতিমারি বলে ঘোষণা করে ততদিনে বিশ্বের ১১৪টি দেশে দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে আক্রান্তের সংখ্যা লক্ষ ছাড়িয়ে চলে গেছে... এবং কোথায় গিয়ে থামবে তার কোন হদিশ ছিলোনা সেদিন বিজ্ঞানীদের কাছে। পৃথিবীর বুকে নেমে এসেছে এক অদ্ভুত আঁধার ... মানবসভ্যতা আরো একবার লড়াই করতে শুরু করল এই অন্ধকারের শেষ দেখবে বলে।

চেনা মুখ অচেনা অসুখ

আমরা আগেই বলেছি করোনা ভাইরাস ২০১৯ সালের আগেও পৃথিবীতে অদ্ভুত দু'বার দেখা দিয়েছিল। তবে প্রতিবারেই সে ভিন্ন চেহারায় দেখা দিয়েছে এবং চরিত্র পালটে ফেলেছে। করোনা নামটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ coronam থেকে যার অর্থ হল মুকুট । হ্যাঁ মুকুট তবে এ কিন্তু কাঁটার মুকুট । আসুন বিজ্ঞানের জটিলতায় বেশি গভীরে না ঢুকে ভয়ে ভয়ে বাইরে থেকেই একটু বুঝে নিই এই ভাইরাসটির আকৃতি গত পরিচয়।

ভাইরাসের একেবারে কেন্দ্রস্থলে আছে জেনেটিক ক্ল-প্রিন্ট যাকে RNA বলা হচ্ছে। RNA কী এটা একটু সহজ ভাবে যদি বুঝতে হয় তাহলে মনে রাখতে হবে যে আর এন এ এবং ডি এন এ দুটোই নিউক্লিক অ্যাসিড । RNA একটি রিবোনিউক্লিক অ্যাসিড এবং DNA একটি ডিওক্সিরিবোনিউক্লিক অ্যাসিড। RNA 'র মধ্যেও থাকে সুগার রিবোস (sugar ribose) যেমন থাকে DNA 'র মধ্যে । দুটোই কার্বোহাইড্রেট তবে DNA 'র ক্ষেত্রে থাকে সুগার ডিওক্সিরিবোস (deoxyribose) যার অর্থ হল একটি অক্সিজেন পরমাণু কম। এছাড়া উপাদান গত ভাবে RNA 'র মধ্যে থাকে চারটি নাইট্রোজেনাস বেস - adenine, guanine, cytosine, uracil অন্যদিকে DNA 'র মধ্যে থাকে adenine, guanine, cytosine, thymine । RNA 'র ক্ষেত্রে নাইট্রোজেনাস বেস পেয়ারিং হয় GC (guanine, cytosine) এবং AU (adenine, uracil) অন্যদিকে DNA 'র ক্ষেত্রে নাইট্রোজেনাস বেস পেয়ারিং হয় GC (guanine, cytosine) এবং AT (adenine, thymine)। উপাদান গত এই পার্থক্য ছাড়াও এদের মধ্যে আর একটি উল্লেখযোগ্য তফাৎ হল আয়তন এবং ওজন । DNA 'র মলিকিউলার ওয়েট হতে পারে ২ থেকে ৬ মিলিয়ন আর RNA 'র মলিকিউলার ওয়েট ২৫০০০ থেকে ২ মিলিয়নের মধ্যেই ঘোরাফেরা করে। আর একটি বিষয় আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন DNA একটি ডাবল স্ট্র্যান্ডেড জৈবিক অণু অন্যদিকে RNA একটি সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ডেড অণু।

DNA 'র মূল কাজ হল জেনেটিক ইনফরমেশন বা তথ্য আদান প্রদান করা এবং অন্য কোষ অথবা জৈবিক অণু সৃষ্টি করা। DNA 'র মধ্যে জেনেটিক তথ্যগুলি দীর্ঘসময় ধরে রাখা থাকে। অন্যদিকে RNA নিউক্লিয়াস থেকে জেনেটিক ইনফরমেশন নিয়ে রিবোজমে পাঠায় এবং প্রোটিন সৃষ্টি করে।

যাইহোক DNA এবং RNA ‘র এইসব তথ্যের মধ্যে আর বেশি মাথা না ঘামিয়ে আমরা এবার করোনা বা কোভিড ভাইরাসের অভ্যন্তরে প্রবেশ করি।

করোনা ভাইরাসের কেন্দ্রে অবস্থিত এই আরএনএ’র যে সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড (এর চেহারা অনেকটা সুতোর মত স্পাইরাল একটি আণুবীক্ষণিক বস্তু) তার সাথে আটকে থাকে নিউক্লিও প্রোটিন গুলি যা এই ভাইরাসটির গঠনের মূলে এবং ভাইরাসটির সংখ্যা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

এই RNA জিনোমের (জিনোম হল দেহের কোষের সেই অংশ যার মধ্যে প্রাণীর শরীরের সমস্ত তথ্য সঞ্চিত থাকে) চারপাশে ঘিরে থাকে একটি ভাইরাল এনভেলপ (মোমের মত একটি পাতলা স্তর বা আবরণ) যা ভাইরাসটিকে রক্ষা করে যখন ভাইরাস হোস্ট সেলের বাইরে থাকে। এটি তৈরি হয় মূলত ফ্যাট দিয়ে।

তবে এই ফ্যাট এনভেলপ শুধু ভাইরাসটিকে রক্ষা করার নিরীহ কাজই করেনা ... এর মধ্যেই সে আশ্রয় দেয় আরো কিছু প্রোটিন স্ট্রাকচারকে যারা ভাইরাসটির অন্য হোস্টের শরীরে সংক্রমণের জন্যে দায়ী। এইভাবে একটি সংক্রমিত শরীরে তৈরী হওয়া অজস্র ভাইরাস গুলোকে একসাথে একত্রিত হয়ে থাকতেও এই এনভেলপ একটা মূখ্য ভূমিকা পালন করে।

একটি করোনা ভাইরাসের ভাইরাল এনভেলপে তিন ধরনের প্রোটিন থাকে – মেমব্রেন প্রোটিন (M) , এনভেলপ প্রোটিন (E) এবং স্পাইক প্রোটিন (S) . এই স্পাইক প্রোটিন এর জন্যেই একটি করোনা ভাইরাসের চেহারা অনেকটা কাঁটার মুকুট এর মত দেখায় এবং সেখান থেকেই এই করোনা নামকরণ ... বলাই বাহুল্য যে হোস্ট সেল বা আশ্রয়দাতার শরীরে প্রবেশ করা এবং তাকে সংক্রমিত করার জন্যে এই স্পাইক প্রোটিনই কার্যকরী ভূমিকা নেয় আর অন্য দুটি প্রোটিনের কাজ প্রধানত ভাইরাসগুলিকে একত্রিত বা একসঙ্গে ধরে রাখা।

করোনা পরিবারের প্রধান প্রধান সদস্যবৃন্দ হলেন -

এক) 229E - সাধারণ সর্দি , জ্বর , কাশি

দুই) MERS – Middle East Respiratory Syndrome যার কথা আমরা আগেই বলেছি

তিন) SARS – CoV - Severe Acute Respiratory Syndrome

এবং এরপরে ২০১৯ সালে বিজ্ঞানীরা একটি নতুন করোনা ভাইরাস চিহ্নিত করলেন SARS – CoV – 2 অথবা Novel Corona Virus । জীববিজ্ঞানীরা নতুন কিছু আবিষ্কার করলে অথবা বর্ণনা করার সময় এই Novel শব্দটি জুড়ে দেন আর যেহেতু মানব দেহে এই নতুন ভাইরাসটির উপস্থিতি এই প্রথম দেখা গেল তাই নামকরণে এই Novel শব্দটিও তার সঙ্গে জুড়ে গেল ।

এই যে আমরা বললাম মানুষের শরীরে সে প্রথম এলো তাই তার নাম হল নোভেল করোনা ভাইরাস এই কথাটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ । এর অর্থ হল মানুষের শরীর এর আগে কখনো এই ভাইরাসের সাথে পরিচিত ছিলোনা । এবং সেই জন্যে এই ভাইরাসের বিরুদ্ধে কীভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে তার জানা নেই। এবং সত্যি কথা বলতে গেলে একটি অজানা ভাইরাসকে নিয়ে এটাই সবথেকে আশঙ্কার । কারণ কতটা তার মারণ ক্ষমতা , কতটা সংক্রমণ করার ক্ষমতা , কোন কোন বয়সী মানুষের জন্যে সে বেশি ক্ষতিকর এইসব কোন তথ্যই জানা থাকেনা । তাই একটি ভাইরাসের আবির্ভাব যখন প্রথম হয় তখন মানবসভ্যতার জন্যে সে প্রাথমিক ভাবে কিছু দুশ্চিন্তা অবশ্যই নিয়ে আসে। এই নতুন করোনা ভাইরাসটিও তাই আমাদের জন্যে নিয়ে এলো একরাশ দুশ্চিন্তা , আশঙ্কা এবং দুর্ভাবনা । তাই ২০১৯ এর শেষ অথবা ২০২০ সালের শুরুতে যে পর্যায়কে ভাইরোলজির পরিভাষায় বলে আউটব্রেক সেই পর্যায়ে বিজ্ঞানীদের হাতে তথ্য বলতে প্রথম সার্স অথবা মার্স এর অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান । এইটুকু নিয়েই বিজ্ঞানীরা লড়াই শুরু করলেন এক অজানা অসুখের সাথে ... আর সেই সাথে এলো এক নতুন বিপদ যার নাম মিথ্যার চাষ এবং বিপণন । এই নিয়ে আলোচনা আমরা পরে করব। আপাতত কিছু তথ্য দিয়ে এই পর্ব শেষ করব ...

২০২০ সালের ১১ই জানুয়ারী আমরা চীন থেকে প্রথম করোনায় মৃত্যুর খবর পেয়েছিলাম । তখনো পৃথিবী নড়ে চড়ে বসেনি সেভাবে । তাই ওয়াশিংটন পোস্টের মত সংবাদমাধ্যম ও কিন্তু এই মহামারীকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে চায়নি । এবং সেই সময়ে তাঁদের মতে ইতিহাসে যে সমস্ত ভয়াবহ মহামারীর কথা আমরা জানি (যেমন ব্ল্যাক ডেথ , জাস্টিনিয়ান প্লেগ ইত্যাদি যে আলোচনা আমরা প্রথম পর্বে করেছিলাম) সেই তুলনায় এই অতিমারি একটি বিন্দুর মত ক্ষুদ্র। সেই বিন্দু’র ধারণা থেকে আজ আমরা যেখানে এসে পৌঁছেছি সেখানে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুযায়ী ২৮ শে জানুয়ারি ২০২২ অবধি এই পৃথিবীতে মোট ৩৬ কোটি ৪১ লক্ষ মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন এই অসুখে যার মধ্যে মৃত্যু হয়েছে ২ কোটি ২৯ লক্ষ মানুষের । আর ভারতবর্ষে এখন অবধি আক্রান্তের সংখ্যা ২ কোটি ৫৬ হাজার এবং মৃত্যুর সংখ্যা ৪ লক্ষ ৯২ হাজার । মনে রাখতে হবে এটা হল

সরকারী পরিসংখ্যান এবং এই সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ীই ইতিমধ্যেই এই করোনা অতিমারী পৃথিবীর ইতিহাসে মৃত্যুর সংখ্যা অনুযায়ী প্রথম দশটা অতিমারীর মধ্যে নবম স্থান নিয়ে নিয়েছে।

এই সঙ্গে আরো একটি তথ্যও আমাদের খেয়াল রাখতে হবে ... সম্প্রতি নেচার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রের দাবী অনুযায়ী প্রকৃত মৃত্যু সম্ভবত এর থেকে আরো অনেক বেশি। তাঁদের মতে যদিও একটি অতিমারীতে পৃথিবীতে প্রকৃত আক্রান্ত এবং মৃত্যুর হিসাব করা বেশ দুঃসাধ্য কারণ এক একটা দেশে পরিসংখ্যান রাখার পদ্ধতি এক একরকম। আবার উন্নত দেশ গুলিতেও সংরক্ষিত তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা সন্দেহের অতীত নয়। তবু তাঁরা একটা স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালিসিস করেছেন সমস্ত তথ্য নিয়ে এবং সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছেন যে প্রকৃত পক্ষে পৃথিবীতে মৃত্যু হয়েছে সরকারি ভাবে ঘোষিত মৃত্যুর থেকে অন্তত ১ কোটি ২০ লক্ষ থেকে ২ কোটি ২০ লক্ষ বেশি। যার অর্থ হল যে হিসাব আমাদের হাতে আছে তার থেকে অন্তত দু থেকে চারগুন বেশি। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এই হিসাব আরো বেশি উদ্বেগজনক। এই হিসাব অনুযায়ী ভারত বর্ষে প্রকৃত মৃত্যুর সংখ্যা ১০ লক্ষ থেকে ৪০ লক্ষ হতে পারে অর্থাৎ সরকারী ভাবে যে হিসাব দেওয়া হচ্ছে প্রকৃত সংখ্যা খুব সম্ভবত তার থেকে চার পাঁচ গুন বেশি।

আসুন এবার আমরা এই মৃত্যুর মিছিল ছেড়ে পরের তৃতীয় তথা শেষ পর্বের দিকে চলে যাই ... যেখানে আমাদের আলোচনার অপেক্ষায় রয়ে গেছে ষড়যন্ত্র তত্ত্ব, গুজবের ইতিবৃত্ত, ভ্যাক্সিন বিতর্ক এবং এই অতিমারীর সম্ভাব্য পরিণতি। (ক্রমশঃ)

আত্মজার কার্যকরী সমিতি ২০২৩ – ২০২৫

অনুপ দেওয়ানজী – চেয়ার পার্সন
অঞ্জন বসু চৌধুরী – ভাইস চেয়ার পার্সন
সঞ্জয় শিকদার – সম্পাদক
শঙ্কর নস্কর – সহকারী সম্পাদক
প্রসুন গাঙ্গুলী – কোষাধ্যক্ষ

“ কার্যকরী সদস্য বৃন্দ ”

সুবীর ব্যনার্জি
নীলাঞ্জনা দাশগুপ্ত
অচিন বসু
দীপঙ্কর পাত্র
সংঘমিত্রা পাল
সীমন্তিকা নাগ
কৌস্তভ ভট্টাচার্য
পি কে চট্টোপাধ্যায়

আত্মজা পরিবারের সমস্ত সদস্যদের প্রতি নতুন বছরের শুভেচ্ছা ও ভালবাসা

আত্মকথা'র সম্পাদক মণ্ডলীর পক্ষ থেকে... স্বপন নস্কর

যোগাযোগ– 9903036928 / 9432321716 / 9051672992

ই মেল – atmaja_calcutta@yahoo.com ওয়েবসাইট – www.atmaja.org.in

Regd.No. S/1L/1184 of 2000-01 under W.B.Societies Act 1961